পথ হারানোর পথ

– সেজান মাহমুদ

নতুন শতাব্দীর আমেরিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে সাধারণ মানুষ আর ক্ষমতাশালীদের সংঘাত নতুন নয়। ক্ষমতাশালীরা মাঝে মধ্যেই ভুলে যায় যে, এই ক্ষমতার উৎস আসলে সাধারণ মানুষ। এ কারণেই সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, স্বপ্ন, আশা–আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাশালীরা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে আরো বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে, পদদলিত করে মানুষের স্বপ্ন–সৌধ, তছনছ করে দেয় অসংখ্য জীবন। এ রকম আরেকটি ক্ষমতা বিস্তারের দুরভিসন্ধি প্রকাশ পেয়েছে পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকার ক্ষমতাশালী একটি শ্রেণীর মধ্যে।

প্রজেক্ট ফর নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি (PNAC) বা *নতুন শতাব্দীর আমেরিকা* নামের একটি প্রজেক্টের কথা প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যদিও বাকস্বাধীনতার দাবিদার আমেরিকার কোনো প্রধান পত্রিকায় তা ছাপা হয়নি। প্রচারিত হয়নি সিএনএন বা ফক্স নিউজ চ্যানেলে। জানি না, বাংলাদেশের পাঠকেরা এই প্রজেক্টের কথা জানতে পেরেছে কি না। এই প্রজেক্টটির কথা সর্বপ্রথম ফাস করে দেন একজন বৃটিশ সাংবাদিক। কিন্তু সেই ২০০০ সালেই ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত Rebuilding America's Defenses : Strategy, Forces and Resources for a New Century শিরোনামের একটি শ্বেতপত্রে এই প্রজেক্টের মূল সুরগুলো অনুরণিত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকেই ওয়াশিংটনের একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উচ্চাভিলাষী চক্র এই প্রজেক্টের পরিকল্পনা করতে থাকে। এই পরিকল্পনার মূল কথা হলো, আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য রাখতে হলে নিম্নলিখিত কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে।

এক. দক্ষিণ ইওরোপ, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী সামরিক ঘাটি স্থাপন।

দুই. আমেরিকান সামরিক বাহিনীগুলোর, বিশেষ করে যুদ্ধ বিমান, সাবমেরিন এবং স্থল পরিবহনের আধুনিকীকরণ।

তিন. গ্লোবাল মিসাইল ডিফেন্স সিসটেম তৈরি করা এবং মহাকাশের আধিপত্য লাভ।

চার. আন্তর্জাতিক সাইবার স্পেস–এর দখলীকরণ।

পাচ. প্রতিরক্ষা ব্যয় জিডিপির ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩.৮ শতাংশ–এ উন্নীতকরণ।

যে কেউ দাবি করতে পারেন, একটি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের এই পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত। খুব গভীরে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে তার পেছনে এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। আর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক পথ সুগম করে দিয়েছে তথাকথিত ইসলামি মৌলবাদী জঙ্গী সংগঠনগুলো। সেপ্টেম্বর ১১–এর ট্র্যাজিক ঘটনার পর যে কোনো আক্রমণাত্মক অবস্থানকেই সমর্থন করবে আমেরিকার জনগণ। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। এখানে লক্ষণীয় যে, ২০০৪ সালের নির্বাচনে দুই প্রার্থীই এক সুরে ইরাক আক্রমণ, আমেরিকার শত্রুদের নির্মূল করা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলে ভোটারদের মন পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিদের বিনোদন ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ছুটির দিনে নিমন্ত্রণ এবং ঘরোয়া আড্ডায় রাজনৈতিক আলোচনা অন্যতম একটি। এসব আড্ডায় মাঝে মধ্যেই কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে, এ দেশের নুন খাচ্ছি, এ দেশের বদান্যতায় সুখী জীবন যাপন করছি, এ দেশের দুর্নাম করা বা সমালোচনা করা ঠিক না।

আমি এ কথার সঙ্গে একমত হতে পারি না। এই মানসিকতা আর দাস মনোবৃত্তির সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই। তাছাড়া এই মনোবৃত্তি আমেরিকা নামের বিশাল দেশের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কিভাবে? তা ব্যাখ্যা করার আগে আমেরিকার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের এবং সহনশীলতার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি।

২০০৩ সালে অ্যালাবামা স্টেটের সুপ্রম কোর্টের সামনে *টেন কমান্ডমেন্ট মনুমেন্টস* স্থাপন করা হয়। এটি একটি ধর্মীয় মনুমেন্ট। কিন্তু সুপ্রম কোর্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া বিচার বিভাগের সামনে একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারীদের মনুমেন্ট এর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন জাগাবে। সুতরাং একজন মামলা করে দেন এর বিরুদ্ধে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আমেরিকার বর্তমান সরকার একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে। তারপরও দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়ে এই মনুমেন্ট তুলে সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে ধর্মকে এক করতে দেয়নি।

অন্যদিকে যে কোনো কাজের জন্য কোনো সিনেটর, কংগ্রেস পারসন, এমনকি স্বয়ং প্রেসিডেন্টকেও জবাবদিহি করতে হয় সবার সামনে। সাম্প্রতিক প্রেসিডেনশিয়াল ডিবেট তার বড় প্রমাণ। সর্বোপরি সেপ্টেম্বর ১১-র মতো ঘটনা যদি আমেরিকায় না হয়ে পৃথিবীর অন্য দেশে হতো তাহলে মুসলমানদের কচুকাটা করতে দ্বিধা করতো না কেউ। সুতরাং এ ধরনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যথার্থ সমালোচনা করা, তা রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পৌছে দেয়া, জনমত তৈরি করে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারণে প্রভাব রাখাই বরং সত্যিকারের আমেরিকা প্রীতির পরিচয় বহন করে। এ কাজগুলো এ দেশের নাগরিক বা স্থায়ী অধিবাসী, এমনকি বেআইনি অধিবাসীরাও করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমেরিকার রাজনৈতিক নেতারা তা শোনেন এবং যথার্থ পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করেন।

আমি ধর্মবাদী নই, বরং ধর্ম নিরপেক্ষ। তারপরও বলবো, যদি ইসলামপন্থীদের জিজ্ঞাসা করা হয়, ইসলামের বড় শত্রু কে বা কারা? উত্তরে তারা হয়তো কোনো দেশ বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের দিকে ইঙ্গিত করবেন। আমি বলবো, ইসলাম ধর্মের নামধারী জঙ্গী সংগঠনগুলো, ইসলাম ধর্মের নামধারী রাজনৈতিক দলগুলো সবচেয়ে বড় শত্রু। এরা পৃথিবীব্যাপী ইসলাম ধর্মকে একটি উগ্র, হাস্যকর, অমানবিক, পশ্চাৎপদ একটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। বাংলাদেশেও তার নমুনা লক্ষণীয়। মহিলা ফুটবলের মতো একটি সুস্থ ক্রীড়াকে এরা বন্ধের হুমকি দিচ্ছে। দিচ্ছে প্রগতিশীল লেখক-বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ফতোয়া। যারা ইসলামের কল্যাণ চান তাদেরই উচিত এ উগ্র, ফতোয়াবাজদের প্রতিরোধ করা।

লেখাটি শুরু করেছিলাম নতুন শতাব্দীর আমেরিকা নিয়ে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমেরিকার রাজনৈতিক ধারা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা পলিসি নির্ধারণ করবে বিশ্বের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি। তাই নতুন শতাব্দীতে আমেরিকার নীতি-নির্ধারকেরা কি পথ বেছে নেবেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা হতে পারে আমেরিকাকে আরো পরাক্রমশালী, যুদ্ধবাজ, একচ্ছত্র পরাশক্তিতে পরিণত করা। হতে পারে একক পরাশক্তির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একচ্ছত্র আদর্শগত নেতৃত্ব অর্জন করা। আমরা আদার বেপারী জাহাজের খবর না নিতে পারলেও এটুকু কামনা করতে পারি, রাজনৈতিক নেতানেত্রীসহ পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হোক, মানবতা জাগ্রত হোক, কল্যাণ হোক সবার।

sezan_mahmud@sbcglobal.net